প্র কা শ না প্র স ঙ্গে

২০১৫ সালের ১৮ অক্টোবর বাংলা আকাদেমি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা। সেদিনটা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। চারপাশে দুগ্‌গো পুজোর হুজুগ্‌। দক্ষিণ কলকাতায় বিশাল পাথরের দুর্গা মূর্তি নিয়ে গোলমাল। ট্র্যাফিক স্তব্ধ প্রায়। ভরসা কেবল মেট্রো রেল। আর সেদিনই এই বক্তৃতা দিলেন অরিন্দম। আমরা সন্ত্রস্ত। একে তো পঞ্চমীর বিকেল, তার ওপর ট্রাফিকের গণ্ডগোল।

এসে গেলেন বক্তা অরিন্দম, এলেন সভামুখ্য অমিতা চট্টোপাধ্যায়। আর কী আশ্চর্য, একটু একটু করে ভরে উঠলো সভাস্থল। ঘোষণায় ও কার্ডে বিষয় ছিল ‘সংশয়বাদ, লোকায়ত দর্শন ও মানুষের হাত’। চার্বাক, বস্তুবাদ ইত্যাদি বিষয়ে বাঙালির আগ্রহ যে বর্তমান, সেদিনের সেই সভায় তা বোঝা গিয়েছিল। বাঙালি-মননে সংশয়াচ্ছন্নতা বোধ হয় যাবার নয়। তবে তার চাইতে বড়ো কথা হলো অরিন্দম চক্রবর্তীর শ্রোতা ও পাঠকের সংখ্যা দু-বাংলাতেই নেহাত কম নয়।

অনুষ্টুপ থেকে বছরে দুটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজনের প্রয়াস করা হয়। সমর সেন ২৩ অগস্ট ১৯৮৭ সালে প্রয়াত হবার পর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রথম সমর সেন স্মারক বক্তৃতা আয়োজিত হয় ১৯৮৮ সালে ফেব্রুয়ারিতে। প্রথম সমর সেন স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন দেবীপ্রসাদ স্বয়ং। তারপর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর প্রয়াণের পর অনুষ্টুপ থেকে সূচনা করা হয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা ১৯৯৪ সাল থেকে। প্রতি বছরে নিয়ম করে নির্দিষ্ট দিনে এই অনুষ্ঠান করা যায়নি। অরিন্দম চক্রবর্তী এর আগে সমর সেন স্মারক বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতাটির শিরোনাম ছিল ‘ভাতকাপড়ের ভাবনা’। তারপর তিনি দর্শনবিষয়ক এই বক্তৃতাটি দিলেন ২০১৫ সালে বাংলাদেশে অন্য একটি বক্তৃতা দিয়ে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরার পথে।

দেবীপ্রসাদ স্মারক বক্তৃতা দিয়েছেন জাক দেরিদা, রিচার্ড ডকিন্স-এর মতো আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বরা। তাছাড়া রামশরণ শর্মা, ব্রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় বাগচী, কল্যাণ সান্যাল, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শিবাজী

বন্দ্যোপাধ্যায়, পরমেশ আচার্য, পলাশ বরন পাল সহ অন্যান্য অনেকে এই বক্তৃতা দিয়েছেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৯ নভেম্বর ২০১৮ সালে নন্দনে এই বক্তৃতা দিয়েছেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। অতীতে সেই সব বক্তৃতা রেকর্ড করে আলাদা করে ছাপাবার কথা ভাবনায় আসে নি আমাদের। অনেক মূল্যবান বক্তৃতা হারিয়ে গেল কালের স্রোতে। হলো অপূরণীয় ক্ষতি। তাই পাঁচ বছর দেরিতে হলেও প্রকাশিত হলো এই দেবীপ্রসাদ স্মারক বক্তৃতা।

অরিন্দম চক্রবর্তী ২০১৫-র পর ব্যস্ততা ও অসুস্থতার কারণে বক্তৃতাটির লিখিত রূপ ভালো করে দেখে ও সংশোধন করে পাঠাতে পারেন নি। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে তাকে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করি অনুলিখনটি সংশোধন ও সংযোজন করে প্রকাশযোগ্য করে দিতে। আমাদের অনুরোধ শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি রক্ষা করেছেন। বক্তৃতাটি আমরা পুস্তক আকারে প্রকাশ করলাম। বক্তৃতার শিরোনামটি তিনি পরিবর্তন করে দিলেন। তাই বইটির নাম হলো *দেহ থেকে সন্দেহ: লোকায়ত দেহাত্মবাদ, সংশয়বাদ ও দুহাত তোলা বস্তুবাদ*।

এই পাণ্ডুলিপি নির্মাণে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর বিকাশ গণ চৌধুরী। পাণ্ডুলিপি নির্মিত হবার পর এটি আর একবার দেখে দিতে পারেন নি অরিন্দম। আমরা নিজ দায়িত্বে পাণ্ডুলিপিটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করছি। জানি না ছাপার ভুল থেকে গেল কিনা। যদি থেকে থাকে তজ্জন্য পাঠকের কাছে অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি।

অনিল আচার্য

০৩/০১/২০১৯

অনুষ্টুপ সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ: দেবীপ্রসাদ স্মারক বক্তৃতা ২০১৫। ১৮ই অক্টোবর রবিবার ২০১৫, বাংলা অকাদেমি সভাঘরে দেবীপ্রসাদ স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী। এটি তারই লিখিত বয়ান।

অনুলিখন: অতনু গুহ

পদার্থবিজ্ঞান, মানে ফিজিক্সকে উত্তর ভারতে বলে ভৌতিক বিজ্ঞান। চার্বাক, তথা লোকায়ত দর্শনের আরেক নাম ''ভূতচৈতন্যবাদ''। তার মানে এই নয় যে ওঁরা প্রেত-ট্রেত নিয়ে চর্চা করতেন। ''ভূত'' মানে ''ম্যাটার''। জড় পদার্থ মাটি, জল, আগুন, বাতাস এইসব। একজন খুব বড় দার্শনিক আছেন, অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁর নাম হল পল চার্চল্যান্ড। তিনি অত্যাধুনিক কালে উৎকট জড়বাদ প্রতিপাদন করেছেন। সেই চার্চল্যান্ড চৈতন্য জিনিসটাকেই অস্বীকার করেন। এঁর মতকে বলা হয় ''এলিমিনেটিভিজ্‌ম্‌'' (Eliminativism)। বস্তুপিণ্ড, পরমাণু, তড়িৎকণা, প্রোটন্‌-ফোটন্‌ এসব সত্যিই আছে। চেতনা বলে কিছু

নেই। এই হল উৎকট জড়বাদ যা আন্তর-মানসিক গুণ-জ্ঞান, সুখ-দুঃখ, এইসমস্ত গুণকে বেমালুম উড়িয়ে দেয় বুদ্ধির ভ্রম বলে। অবশ্য আমার মতো চৈতন্যসত্তায় দৃঢ়বিশ্বাসী অথচ বাস্তববাদী চিন্তকের মনে প্রশ্ন জাগে ''আজ্ঞে কিসের ভ্রম বল্লেন এখুনি? বুদ্ধির? সেটা আবার কি? একরকমের খনিজ পদার্থ?

চার্বাক কিন্তু চৈতন্যকে অস্বীকার করেন নি। এবারে এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি, শহরে সবাই বলাবলি করছে যে, কোথাও একটা নেকড়ে বাঘ কোনও কোনায় লুকিয়ে আছে। এদিকে দার্শনিক চার্বাকের বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। স্ত্রী একদম নিশ্চিত—সবাই বলছে নেকড়ে বাঘ এসেছে, অতএব নেকড়ে বাঘ এসেছে। চার্বাক তাকে জিজ্ঞেস করছেন—তুমি কি দেখেছ নেকড়ে বাঘ? নিজের চোখে দেখেছ? অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করছেন না। স্ত্রী বলছেন—সবকিছু কি নিজের চোখে দেখা যায়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন তাই।

রাত্রিবেলা চার্বাক এমন কিছু করছেন যার কথা পরে বলব। সকালে নগরতোরণের নীচে পুরবাসীদের ভিড়

জমে গেছে। রাস্তার ধুলোর ওপরে স্পষ্ট নেকড়ের থাবার চিহ্ন। চার্বাকের বউ আতঙ্কিত। চার্বাক তাকে ভিড়ের মধ্যে ঠেলা দিয়ে বলছেন, 'ভদ্রে! বৃকপদম পশ্য'। দেখ, নেকড়ে বাঘের পায়ের ছাপ। এই গল্পটা হরিভদ্রসূরি-প্রণীত *ষড়্দর্শন সমুচ্চয়*-এ পাওয়া যায়, চার্বাক দর্শনের মধ্যে খালি এই লাইনটুকু পাওয়া যায়—'ভদ্রে! বৃকপদম্ পশ্য'।

সৌভাগ্যক্রমে এর একটা ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাটা করা নেই। ইঙ্গিতে গল্পটা একটুখানি বলা হয়েছে। আমি আবার একটুখানি ফলাও করে বলব। ব্যাপার হচ্ছে, রাত্রে যখন চার্বাকের বউ ঘুমোচ্ছে, তখন চার্বাক গিয়ে ঐ নগরতোরণের নীচে নিজের হাত মুঠি করে ছাপ ফেলে এসেছে। পরদিন সকালে যখন ভালো করে আতশ কাচ দিয়ে বিশেষজ্ঞরা দেখে বলছে—হ্যাঁ, নিশ্চিত। এটা নেকড়ে বাঘেরই পায়ের ছাপ। তখন চার্বাক বউকে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বলছে, 'ভদ্রে! বৃকপদম্ পশ্য।'

বক্তব্যটা কী? বক্তব্য হল এই: আমরা যাকে সায়েন্সের ভাষায়, বিশেষজ্ঞের অভিমত বলি, এটা

তাই। মেডিকেল সায়েন্স এখন এভাবেই চলে। সেটা হচ্ছে কি—সেই method-টি যাঁরা কার্ল পপার-এর *Logic of Scientific Discoveries* একটু-আধটু দেখেছেন, তাদের কাছে জানা জিনিস। একে বলে *হাইপোথেটিকো ডিডাক্টিভ মেথড* (প্রাকল্পিক আরোহ পদ্ধতি) অর্থাৎ একটা কোনো ঘটনা ঘটছে যার ব্যাখ্যা দিতে হবে। যেমন, পায়ে একটা র‍্যাশ বেরোচ্ছে। এই র‍্যাশটা কী? র‍্যাশ বেরোলে ডাক্তার বলবেন, দিজ্ র‍্যাশেস্ মিন মিজ্‌ল্‌স্। গায়ে ওই রক্তিম দাগগুলির মানে 'হাম' হয়েছে। কী করে বললেন? তার কতকগুলো ধারণা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে আছে। যেমন, অনেকসময় ডাক্তাররা একটা ওষুধ দেন, সেই ওষুধের ফলে যদি রোগ কমে যায়, তবে তার থেকে deduce করেন যে, সেটাই হয়েছে। পদ্ধতিটা হচ্ছে এই যে, একটা হাইপোথেসিস তৈরি করা।

একটা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটা প্রকল্প বা একটা হাইপোথেসিস তৈরি করা হয়। সেই হাইপোথেসিসটা থেকে কতকগুলো ডিডাকসান করা